মহান একুশে বইমেলার ৫০ বছর

জহর লাল সাহা

৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ১২:০০ এএম | আপডেট: ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ ০৮:৩১ এএম

3
Shares

advertisement

প্রতিবারের মতো এবারও ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে মহান একুশের বইমেলা হচ্ছে যথাযথভাবে, যথাযথ স্থানে, যথাযথ সময়ে। সেই ১৯৭২ সালে বাংলা একাডেমির চত্বরে ঘাসের মধ্যে চট বিছিয়ে বই বিক্রি ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন বাংলাদেশের প্রথিতযশা প্রতিষ্ঠান মুক্তধারার কর্ণধার একুশে পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব, বাংলাদেশের শিক্ষা বিস্তারে নিবেদিতপ্রাণ চিত্তরঞ্জন সাহা। একটু একটু করে ধীরে ধীরে হাঁটি হাঁটি পা পা করে হাঁটতে হাঁটতে তা এখন বিস্তৃত হয়েছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। অনেক কিছুই শুরুতে এমন ছিল না, এখন যেমন দেখছি মেলাকে। সত্তরের দশক থেকে আশির দশকের মাঝামাঝি প্রচারমাধ্যমগুলোর সক্রিয়তা তেমন দেখা যায়নি। এর পর থেকে মিডিয়া মেলার খবর কিছুটা প্রচার করতে আরম্ভ করে।

ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলোও ধীরে ধীরে মেলার খবর প্রচার করতে তৎপর হয়ে ওঠে। ১৯৭২ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বলতে গেলে বইমেলার খবর প্রচারে মিডিয়া, বিশেষ করে ইলেকট্রনিক মিডিয়া আজকের মতো অতটা ভূমিকা রাখতে পারেনি। ১৯৯০-এর পর একুশের বইমেলা একটা আনুষ্ঠানিক নিয়ম-কানুনের মধ্যে আসতে থাকে। এখন যেমন মেলা আরম্ভ হওয়ার দু-একদিন আগে থেকে

মিডিয়াগুলো, বিশেষ করে ইলেকট্রনিক মিডিয়া তথ্যসমৃদ্ধ খবর প্রচার করতে থাকে, '৯০-এর আগে ততটা ছিল না। বলতে গেলে নব্বইয়ের দশকের পর থেকে একুশের বইমেলা একটি নীতিমালার মধ্য দিয়ে চলতে আরম্ভ করে। এখন বইমেলায় অনেক কিছু দেখা যায়, যেমন মেলার মাঠে একটি তথ্যকেন্দ্র থাকে, যেখান থেকে মেলায় আসা নতুন বইয়ের খবর, প্রকাশনীর নামসহ প্রচারিত হয়। নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচনের খবর মাইকে তথ্যকেন্দ্র থেকে প্রচার করা হয়। মেলার নিয়ম-কানুন মেনে চলা হচ্ছে কিনা তার জন্য নীতিমালা কমিটির সদস্যরা ঘুরে ঘুরে মেলার মাঠে স্টলগুলো দেখেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, দমকল বাহিনী মেলা কখন আরম্ভ হবে, প্রতিদিন মেলা কখন শেষ হবে ইত্যাদি সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নীতিমালার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়, যা আগে ছিল না। আগে বাংলা একাডেমির মূল গেট দিয়ে মেলায় প্রবেশ এবং বেরোনোর ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু যুগের পরিবর্তনে এবং অবস্থার প্রেক্ষাপটে অনেক কিছু করতে হয়েছে। মেলায় আসা ব্যক্তিরা যাতে সপরিবারে মেলা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে এবং বের হতে পারেন তার জন্য এখন বাংলা একাডেমিতে দুটি গেট করা হয়েছে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানেও একই ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই পদ্ধতিগুলো প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটেই করা হয়েছে। হয়তো যুগের পরিবর্তনে চাহিদার প্রয়োজনে আরও অনেক কিছু নতুন নতুন ব্যবস্থা নিতে হতে পারে, মেলাকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করার স্বার্থে।

advertisement

মেলার মাঠে ক্রেতা এবং বিক্রেতাদের সুবিধার্থে এখন অস্থায়ীভাবে ব্যাংকের বুথ খোলা হয়েছে। এখন ক্রেতাদের সুবিধার্থে ক্রেডিট কার্ড ও ডেবিট কার্ড চালু করা হয়েছে। ধীরে ধীরে এই ব্যবস্থা আরও সচল হয়ে উঠবে, যখন আমাদের ক্রেতা-বিক্রেতারা আরও সচেতন হয়ে উঠবেন। যদিও উন্নত দেশগুলোতে কার্ডের মাধ্যমে অধিকাংশ লেনদেনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। ক্যাশে কেনাকাটা করার কথা উন্নত বিশ্বে ভাবাই যায় না। এসব ব্যবস্থা '৯০-এর আগে দেখা যায়নি।

advertisement 4

বাংলা একাডেমির ভেতরে আগে কোনো বইয়ের প্যাভিলিয়ন ছিল না। কিন্তু চাহিদার প্রয়োজনে বাংলা একাডেমিতে স্থান সংকুলান না হওয়ায় মেলা এখন বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিস্তৃত পরিধিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এখন বড় বড় প্যাভিলিয়ন হচ্ছে। আগে এমনটা ছিল না।

অন্যভাবে ভাবতে গেলে মনে হয়, প্রথম অবস্থায় একুশের বইমেলার মধ্যে একুশের যে একটা চেতনা পরিলক্ষিত হতো, এখন তা মনে হয় না। তখন বাংলা একাডেমির বটবৃক্ষের নিচে, আমগাছের মাঝে, পুকুরপাড়ে, কেমন যেন একটা সংস্কৃতির ছোঁয়া দেখা যেত, এখন কেন যেন সেটা মনে হয় না। বাংলা একাডেমির ভেতরে পুকুরপাড়ে বসে আড্ডা দেওয়া, ফুচকা কিংবা গরম গরম ফুলকপির বড়া খাওয়ার মধ্যে যে মজা পাওয়া যেত, নতুন প্রজন্ম তা থেকে বঞ্চিতই হচ্ছে মনে হয়। যদিও এখনো পুকুরপাড় আছে, এখনো ওখানে বইয়ের স্টল বসে, তবে বেশিরভাগই সরকারি এবং আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্টল থাকে সেখানে। তেমন প্রাণচাঞ্চল্য এখন আর আগের মতো ওখানে দেখা যায় না।

আমরা যেন ফেব্রুয়ারি মাস ভাষার মাস, বাংলা ভাষার জন্য যারা প্রাণ দিয়ে গেছে তাদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের স্মরণ করি, কালো ব্যাজ ধারণ করার মধ্য দিয়ে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা-সমবেদনা জানাই, তাদের নিয়ে ব্যাপকভাবে আলাপ-আলোচনার কথা ভুলে গিয়ে অন্য দিকে ধাবিত না হই।

একুশের বইমেলা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে মনে পড়ে যায় সেই দিনগুলোর কথা, যখন হাইকোর্ট মাজার থেকেই জুতো হাতে করে হেঁটে গিয়ে লাইন ধরে শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেই বাংলা একাডেমিতে অমর একুশের বইমেলায় ঢুকে পুকুরপাড়ে বসে গরম গরম ফুলকপির বড়া-শিঙাড়া হাতে নিয়ে খেতাম। কী যে আনন্দ হতো তখন বলে বোঝাতে পারছি না। এখন যা হচ্ছে তার মধ্যে তেমন জীবনের সন্ধান পাওয়া যায় না। এখন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে রেস্টুরেন্টে বসে নাস্তা করতে হয় যা অন্যান্য জায়গার রেস্টুরেন্টের চেয়ে আলাদা কিছু নয়। সেখানে একুশের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বইমেলা যেন অনেকটা বাণিজ্যমেলার মতো। মনে হয় আগেই যেন ভালো ছিল।

এখনো অবশ্য শহীদ মিনারের কাছাকাছি জায়গায় এসে খালি পায়ে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এই প্রথাটা যেন নতুন প্রজন্ম ধারণ করে ভবিষ্যতের দিনগুলোর দিকে এগিয়ে যায় তাতে আমরা যারা এখন না ফেরার দেশে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি তারা যেন পরপারে যাওয়ার আগে যেতে পারি যে, আমাদের প্রজন্ম শহীদদের স্মৃতি অথবা তাদের প্রতি যথাযথভাবে সম্মান প্রদর্শন করে তাদের আত্মত্যাগকে সার্থক করে তোলে। নতুন প্রজন্মকে ভাষার মাসের ইতিহাস জানতে হবে, তাদের জানতে হবে বাংলা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসের কথা, জানতে হবে সালাম, বরকত, জব্বারসহ যারা

ঢাকার তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে, বর্তমানে যা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রূপান্তরিত হয়েছে, পুলিশের গুলিতে বুকের রক্ত ঢেলে রাষ্ট্রভাষাকে বাংলা ভাষার মর্যাদা দিয়েছে তাদের কথা। জানতে হবে আমাদের শিকড়ের কথা। মূলত সেসব শহীদকে স্মৃতিতে স্মরণ করার প্রেক্ষাপটেই আজকের একুশে বইমেলা।

এত বড় আকারের বইমেলা পৃথিবীর কোথাও নেই। সারা বিশ্ব জানে আমাদের এই একুশের বইমেলার কথা। আমাদের একুশের বইমেলা এখন যেমন বিশাল আকারের একটা মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে, আগেও তেমন ছিল। এখনো শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, ছাত্র, শিক্ষকসহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এক মাস ধরে এই মেলাকে কেন্দ্র করে বছরে একবার মিলিত হন। একে অপরের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন, গল্প-আড্ডা সবাই যেন এখানে এসে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ান। একুশে বইমেলা এখন জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। অবশ্য এই ধারাটা আগেও অব্যাহত ছিল।

বাংলাদেশ আমার দেশ, বাংলাদেশ আমাদের দেশ, আমরা বাংলাদেশি, বাংলা আমাদের মুখের ভাষা; আমরা বাংলায় কথা বলি। আমরা গর্বিত যে, ইউনেস্কো আমাদের ভাষাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে ইতোমধ্যেই স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই আমরা আমাদের মায়ের ভাষা বাংলা ভাষাকে দেশের ভেতর তো বটেই, বিদেশেও ছড়িয়ে দেব প্রকাশনার মাধ্যমে, মানসম্পন্ন বই প্রকাশের মাধ্যমে পৃথিবীর মানুষের মধ্যে, যাতে তারাও আমাদের ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং এ ভাষা শিখে তারাও আমাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে জানতে পারে, বুঝতে পারে। আর তখনই এ ভাষার জন্য যারা শহীদ হয়েছেন, তাদের আত্মত্যাগ সার্থক হবে এবং দূর থেকেও তারা শান্তি পাবে এই ভেবে যে, তাদের আত্মত্যাগ সার্থক হয়েছে।

জহর লাল সাহা : লেখক ও প্রকাশক

3
Shares